ক্রুশ-বাইবেলের অন্তরালে



শিবপ্রসাদ রায়

ক্রশ-বাইবেলের অন্তরালে

শিবপ্রসাদ রায়

তুহিনা

৩০/৬/২এ, মদন মিত্র লেন
কলকাতা-৭০০০০৬

প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারী, ১৯৮২

প্রকাশক
তপন কুমার ঘোষ
৫, ভুবন ধর লেন
কলকাতা-৭০০০১২

মুদ্রক
মহামায়া প্রেস এন্ড বাইন্ডিং
২৩, মদন মিত্র লেন
কলকাতা-৭০০০০৬

প্রাপ্তিস্থান
তুহিনা প্রকাশনী
১২সি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০৭৩

মূল্য ঃ [illegible].০০ টাকা

এই লেখকের অন্যান্য রচনা

সময়ের আহ্বান
আমি স্বামীজি বলছি
অনুপ্রবেশ বিশ্বযুদ্ধে ভারত দখল
চতুর্বর্গ / বঙ্কিমচন্দ্র / তিন বিঘা নিয়ে
আমরা ও তোমরা
ছাগলাদ্য নেতৃত্ব এবং কাশ্মীর
আসুন সবাই মিলে আর এস এসকে খতম করি
নস্ট্রাডামাসের সেঞ্চুরী ও পৃথিবীর ভবিষ্যৎ
সর্বধর্ম সমন্বয়কারী হইতে সাবধান
বর্তমান হিন্দু মুসলমান সমস্যা
ধর্ম নিয়ে দু'চার কথা
দর্পণে মুখোমুখী
রহস্যময় আর এস এস
চলমান ঘটনা বহমান পর্বত
রক্তে যদি আগুন ধরে
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নামে বজ্জাতি
ক্রুশ বাইবেলের অন্তরালে
দেশে দেশে জয়যাত্রা
আর এক সুকান্ত
হাসির চেয়ে কিছু বেশী
শয়তানেরা ঘুমোয় না
বুদ্ধিজীবী সমীপেষু
We want Babri Maszid
মারমুখী হিন্দু

।। ক্রুশ-বাইবেলের অন্তরালে ।।

আজকের পৃথিবীতে প্রত্যেকটি তত্ত্ব বা আদর্শের পুনর্মূল্যায়ণ হচ্ছে। যুক্তি বুদ্ধি এবং বিজ্ঞানের আলোয় নির্ণীত হচ্ছে তার প্রকৃত চরিত্র। মানব সভ্যতার জন্য তার আদৌ কোন প্রয়োজন আছে কিনা বিচার বিবেচনা করে বর্জিত অথবা গৃহীত হচ্ছে। ধর্মের নামে খৃষ্টীয় মতবাদ পৃথিবী জুড়ে কাজ করে চলেছে দীর্ঘদিন। শিক্ষা, সেবা, চিকিৎসা, প্রশান্ত পরিবেশে গীর্জা, ভদ্র পোষাক আর নম্র ব্যবহার দিয়ে তারা নিজেদের প্রোজেক্ট করেছে আর্তের সেবক এবং মানবতার পূজারীরূপে। তাদের প্রোজেক্ট করা মুখোশেই এদেশের মানুষ মুগ্ধ। বিনা পয়সায় বাইবেল পেয়ে তারা কৃতজ্ঞ। কম পয়সায় কেনা ষ্টীলের ক্রুশ বুকে ঝুলিয়ে তারা কৃতার্থ। ক্রুশ এবং বাইবেলের অন্তরালে কী বীভৎস এক ষড়যন্ত্র এবং সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত রয়েছে তা জনগণ দেখেও না দেখার ভান করেন। ঠোঁটকাটা জর্জ বার্ণাড শ অনেকদিন আগে লিখে দিয়ে গেছেন ঃ খৃষ্টান মৌলবাদীদের মুখের ওপর বলে দেওয়া উচিৎ তাদের বাইবেল বর্ণিত ঈশ্বর ঈশ্বরই নন অসভ্য বর্বর চিন্তাসঞ্জাত ভুয়ো দেবতা। বাইবেলে আছে শুধু মনোগ্রাহী অবিশ্বাস্য সব গল্প। যা অন্ধ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। বাইবেল বিজ্ঞান বিরোধী, বিবর্তন বিরোধী। বাইবেল শেখা মানুষই সবথেকে নির্বোধ মানুষ। যদি আমার কথায় অবিশ্বাস হয় তাহলে যে কোন চাকরীর পরীক্ষায় প্রশ্নগুলির উত্তর আপনি বাইবেল লব্ধ জ্ঞানে দেবার চেষ্টা করুন। আপনার কপাল ভাল থাকলে শুধু ফেল করান হবে। কপাল খারাপ থাকলে আপনি পাগলের সার্টিফিকেট পাবেন। জর্জ শেষে বলেছেন কোন দেশ দখলের আগে খৃষ্টানেরা প্রথম পাঠায় ক্রুশ-বাইবেল-মিশনারী। তারপর ইম্পিরিয়ালিজম অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ। আর একজন খ্যাতিমান ব্যক্তি যিনি খৃষ্টান সমাজেরই অন্তর্গত। সেই টমাস পেইন তীক্ষ্ণ ভাষায় প্রকাশ করেছেন তাঁর ক্ষোভ ঈশ্বরের অবমূল্যায়ণে মানুষের নৈতিক উন্নতির বিরোধিতায়, সর্বপ্রকার যুক্তি ও সুস্থ চিন্তার বিরোধিতায় খৃষ্টধর্ম বলে প্রচারিত তন্ত্রের মত আর কেউ নেই। যখন নোংরা গল্প, বীভৎস ব্যভিচার কাহিনী, নৃশংস অত্যাচার, হত্যাকাহিনী এবং নির্বিচার প্রতিহিংসাপরায়ণতার বিবরণে পরিপূর্ণ বাইবেল

পড়ি, তখন যুক্তির খাতিরেই বলতে হয় বাইবেলের কথাগুলি ভগবানের নয়, শয়তানের বক্তব্য। এ আসলে শঠতার ইতিহাস যা পড়ে মানবজাতি চরিত্রহীন ও নৃশংশ হয়েছে। যেহেতু আমি সবরকমের নৃশংসতাকে ঘৃণা করি তাই আমি বাইবেলকেও ঘৃণা করি। লিও টলস্টয়ের মত মহাজ্ঞানী ব্যক্তিরও খৃষ্টান মতবাদকে বুঝতে ভুল হয়নি। তাঁর মন্তব্য খৃষ্টধর্মের মত অন্য কোন ধর্মমতই এত অনৈতিক এবং জ্ঞানবিরোধী নয়। ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে পাঠিয়েছেন মানুষের পরিত্রাণের জন্য, একথা আগে থেকে জেনে, যে মানুষ তাকে হত্যা করবে এবং চিরতরে পাপসাগরে নিমজ্জিত হবে। আর মুক্তি শুধু সম্ভব হবে এই মতবাদে দীক্ষিত হয়ে। ঈশ্বরের পুত্র মানুষের হাতে নিহত হয়েছিলেন মানুষকেই রক্ষা করার জন্য, একথা বিশ্বাস না করলে ঈশ্বর তাদের শাস্তি দেবেন। এত অবাস্তব এবং অশুদ্ধ চিন্তায় এ যুগের বুদ্ধিমান মানুষ বিশ্বাস করতে পারে না। এবার বিশিষ্ট দার্শনিক বার্ট্রাণ্ড রাসেল। তিনি বলেছেন প্রত্যেকটি মানবীয় কাজে বাধা দিয়েছে সংগঠিত চার্চ। ক্রীতদাস প্রথা উচ্ছেদের বিরোধিতা, শ্বেতাঙ্গ ছাড়া বাকীদের প্রতি তাদের ব্যবহার তার জ্বলন্ত প্রমাণ। ঐতিহাসিকভাবে যীশুখৃষ্ট বলে কেউ ছিলেন কিনা নিশ্চয় করে বলা যায় না। যদি ছিলেন বলে ধরে নেওয়া যায় তাহলে তাঁর নৈতিক চরিত্রে আমার দৃষ্টিতে একটি ত্রুটি ধরা পড়ে। সেটা হচ্ছে তিনি নরকে বিশ্বাস করতেন। আমি বিশ্বাস করি না মানবতায় বিশ্বাসী কেউ অনন্ত শাস্তির কল্পনা করতে পারেন। গসপেলে যীশুর যে বর্ণনা আছে তাতে বোঝা যায় যে তিনি অনন্ত নরকে বিশ্বাসী এবং তারা তাঁর কথা শোনেনি তাদের প্রতি তাঁর হিংসাজনিত ক্রোধ ছিল অতি প্রকট। জার্মান দার্শনিক নিটশে বলেছেন খৃষ্টধর্ম একটি অভিশাপ। নিজেদের রক্ষার জন্য যে কোন ধরণের প্রতিশোধ গ্রহণ করাকে তারা সামান্য কাজ মনে করে। আমি একে মানবসমাজের কলংক মনে করি। কবি বায়রণও বলেছেন ঃ খৃষ্টান ধর্মের ভিত্তিই হচ্ছে "অবিচার"। এইসব প্রজ্ঞাবান মানুষগুলি তাদের বুদ্ধি মেধা দিয়ে খৃষ্ঠধর্মের মুখটা দেখেছিলেন। বাকীরা দেখতে পাচ্ছেন শুধু মুখোশটা। যেখানে বেশ কড়া করে লাগানো আছে প্রেম প্রীতি ভালবাসার মেক আপ। খৃষ্টানেরা যেখানে গেছে সেখানকার সভ্যতা সংস্কৃতিকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। যারা প্রতিরোধ

করে নিজেদের স্বকীয়তা রক্ষা করতে চেয়েছে, সর্বশক্তি দিয়ে খৃষ্টানেরা তাদের পৃথিবী থেকে বিলুপ্তি ঘটিয়ে দিয়েছে। রেড ইণ্ডিয়ানদের অসংখ্য প্রজাতির আর পৃথিবীতে নেই। গণহত্যা নয় আগমার্কা প্রেমের ধর্ম খ্রীষ্টানদের ইতিহাস হচ্ছে বিভিন্ন জাতিকে সমূলে বিনাশ করা। যারা মৃত্যু চায়নি তাদের বিসর্জন দিতে হয়েছে ধর্ম সংস্কৃতি স্বাধীনতা। আফ্রিকা, এশিয়া, অস্ট্রেলিয়ার অধিকাংশ মানুষ খ্রীষ্টান সাম্রাজ্যবাদের প্রজামাত্র। যারা রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেয়েছে তারাও সাংস্কৃতিক দাস। আফ্রিকান নেতা, জোমো কেনিয়াট্টা বলেছেন ঃ প্রেমের অবতাররূপে খ্রীষ্টান ফাদারেরা এসে আমাদের হাতে পবিত্র বাইবেল ধরিয়ে দিয়ে বল্লেন, তোমরা চোখ বুজে যীশুর শরণ নাও। আমরা ভক্তিতে চোখ বুজে রইলাম। যখন চোখ খুললাম তখন দেখি আমাদের হাতে শুধু বাইবেলটা আর ওদের দখলে গোটা দেশ। ভারতবর্ষেও বহু হিন্দুবাড়ীতে যীশুর মূর্তি, ছবি থাকে। যীশুর জন্মদিনে বহু হিন্দু নরনারী মিছিলে অংশগ্রহণ করে নিজেদের ধন্য মনে করে। খ্রীষ্টান স্কুলে ছেলেমেয়েকে ভর্তি করতে পারলে গৌরববোধ করে। এইসব বিদ্যালয়ের পঠন পাঠন শৃংখলার প্রশংসা হয়। বড় চক্রান্তের উপাদানগুলিকে আপাতশুভ্র রাখতেই হয়। সতী নারীদের তুলনায় বহু কলগার্লের মুখে অতিরিক্ত সারল্য এবং পবিত্রতার ভাব থাকে। যেমন যে কোন ভদ্রলোকের তুলনায় ক্রিমিনালদের বডি থাকে ভীষণ ফিট্। সাধু সন্ন্যাসীদের যে কোন সংগঠনের তুলনায় স্মাগলিং র‍্যাকেটের সদস্যদের ডিসিপ্লিন আনুগত্য অনেক বেশি। খৃষ্টানরাও নানা বাহ্যিক আর্কষণে জন্য সমাজকে প্রভাবিত করে। ধীরে ধীরে তাদের ধর্মান্তরিত করে। খৃষ্টানদের সংখ্যা যেখানে যে পরিমাণে বাড়তে থাকে সঙ্গে সঙ্গে সেইসব রাজ্যে বাড়তে থাকে বিচ্ছিন্নতা এবং সন্ত্রাস। মিজোরাম, নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর, অরুণাচল, ত্রিপুরায় যা দেখা যাচ্ছে। বিদেশ থেকে এদের এই কাজের জন্য আসে কোটি কোটি ডলার। সেবা-চিকিৎসা-শিক্ষাখাতে এই টাকা ব্যয় করা হয়। রাজনৈতিক দলের নেতাদের প্রভাবিত করার জন্য টাকা দেওয়া হয়। যাতে এদের রাষ্ট্রবিরোধী কাজে কোন বাধা না আসে। লক্ষ্যণীয় এ পর্যন্ত কোন বাধা আসেনি। সাহিত্য নাটক, যাত্রা, সিনেমা, দূরদর্শন, সংবাদপত্রে এ টাকার একটি বড় অংশ যায়। খৃষ্টানদের একাধিক আন্তর্জাতিক

চেইন বা চক্র আছে। তার ফলে খৃষ্টান রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধানেরা ভারত সরকারকে প্রভাবিত করে খৃষ্টান সাম্রাজ্যবাদের অনুকূলে সহায়তা আদায় করে। ভারতেও দেখা যায় রামকৃষ্ণ মিশন কিম্বা ভারত সেবাশ্রম সংঘের পক্ষে যে কোন সরকারী কাজ করানোটা যতটা কঠিন খৃষ্টান মিশনারীদের পক্ষে সে কাজ ততটাই সহজ। যীশুর অপার মহিমা আর দয়াময় খৃষ্টান ফাদার মাদারদের কল্যাণে গোটা উত্তর পূর্বাঞ্চল আজ আগ্নেয়গিরি। মিজোরামের খৃষ্টান লালডেঙ্গা প্রকৃতপক্ষে ভারত সরকারের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। ইন্দিরা গান্ধীকে মিলিটারী নামিয়ে মিজোরামকে নিয়ন্ত্রণে আনতে হয়। অবাক হবার মত কথা, কিন্তু সত্যি! '৮৯-এর নির্বাচনে রাজীব গান্ধী মিজোরামে গিয়ে বিবৃতি দিয়েছিলেন খৃষ্টান রাজ্য করার জন্য আপনারা কংগ্রেসকে ভোট দিন। অন্যদল এ মন্তব্যের প্রতিবাদ করেনি। মিজোরামে অখৃষ্টান মানে হিন্দুরা যখন তখন লাঞ্ছিত নিহত হয়। খৃষ্টানদের সংখ্যা বেশী হবার জন্যই স্বতন্ত্র রাজ্য হল। তাতেও খৃষ্টানেরা সন্তুষ্ট নয়, তারা পৃথক রাষ্ট্র চায়। লণ্ডনে বসে খৃষ্টান নাগা নেতা মুইভা বিচ্ছিন্নতাবাদ আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। তরাই অঞ্চলটি খৃষ্টানদের করার জন্য একদার কংগ্রেস সম্পাদক দার্জিলিংয়ের থিয়োডর মেনন আমেরিকায় বসে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। ত্রিপুরার টি. এন. ভি. নেতা বিজয় রাংখেল যিনি হাজার হাজার বাঙালী হিন্দুকে হত্যা করেছেন, তিনিও একজন খ্রীষ্টান। এখন তিনি ত্রিপুরায় প্রায় ক্যাবিনেট মন্ত্রীর মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। এঁর হেড কোয়ার্টার ছিল বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের শিলুং পর্বতমালায়। এদের পরিকল্পনা উত্তর পূর্বাঞ্চলকে একটি খ্রীষ্টভূমিতে রূপান্তরিত করা। এদের প্রভাব প্রতিপত্তি এবং আত্মবিশ্বাস এত গভীর যে এই রাষ্ট্রের নামাকরণ পর্যন্ত হয়ে গেছে। সমস্ত হিল এরিয়া নিয়ে যে রাষ্ট্র হবে তার নাম নিউ ইংল্যাণ্ড। এ পরিকল্পনা রচিত হয়েছে ১৯৫৩ সালে। যাঁরা একথা দেশকে জানাবেন তাঁরা টাকার বিনিময়ে "রাজার রাজা যীশু" কিম্বা "মহিমময়ী টেরেসা" গ্রন্থ লিখে বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ নিচ্ছেন। আর এই রাজ্যগুলি কার্য্যতঃ ভারত থেকে প্রায় পৃথক হয়ে যাচ্ছে। আইজল, কোহিমা কিম্বা ডিমাপুরে বহু মানুষ গল্প করতে করতে নির্দ্বিধায় বলেন আমাদেরও একবার ইণ্ডিয়ায় যেতে হবে। মিজোরাম, নাগাল্যাণ্ডের

ভিতরে যেতে হলে এখনই পাশপোর্টের মত ইনারলাইন পাশের প্রয়োজন হয়। স্থানীয় অধিবাসীরা ছাড়া নিজের নামে জমি কিনতে পারে না, ব্যবসা করতে পারে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়তে গেলে বাইবেল পড়তে হচ্ছে, খ্রীষ্টীয় প্রার্থনা আবশ্যিক। ফলে এদের খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করাটা সহজ হয়ে যায়। যারা খ্রীষ্টান হয়না তারা হিন্দুধর্ম সম্পর্কে উদাসীন হয়ে যায়, অবজ্ঞা পোষণ করে। এতেও খ্রীষ্টানদের লাভ। যারা ধর্মান্তরিত হয় তারাও ঠিক খ্রীষ্টান হয় না। তাতেও হিন্দুসমাজ কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় একটি ঘটনায় তা সহজে বোঝা যাবে। ঘটনাটি অনেকদিনের, জগজীবন রাম তখন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী। উত্তরপ্রদেশের একটি হরিজন পল্লীতে একজন ফাদার অনেকদিন ধরে চেষ্টা চালিয়ে বেশকিছু ব্যক্তিকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করেছিল। তারা অভাবে অনটনে পড়ে কিছু গম, দুধ, টাকার জন্য এ কাজে বাধ্য হয়েছিল। তাদের মনে মধ্যে জীবিত ছিল দীর্ঘদিনের হিন্দু সংস্কার। খ্রীষ্টান হয়েও তারা প্রত্যেক বছরের মত সেবারেও কালীপুজো করছিল। মদ্যপান করে ঢাকের বাজনার সঙ্গে তারা মূর্তির সামনে নাচছিল। কি কারণে সেই ফাদার ওখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। এই দৃশ্য দেখে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে কালীমূর্তিটা লাথি মেরে ফেলে দিলেন। হরিজনরা এই ঘটনায় উত্তেজিত হয়ে ফাদারকে বেঁধে হাড়িকাঠে ঢুকিয়ে দিল, উদ্দেশ্য বলিদান। জগজীবন রাম তখন ঐ পথে যাচ্ছিলেন। তাঁর হস্তক্ষেপে ফাদারের প্রাণ বেঁচে যায়। এই ঘটনা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এর কিছুদিন পরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের তৎকালীন প্রধান শ্রীমাধবরাও গোলওয়ালকর বেশকিছু খৃষ্টান ধর্মযাজকের সঙ্গে একটি বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে তিনি এই ঘটনার উল্লেখ করে বলেন ঃ হাজার হাজার বছরের হিন্দু সংস্কার কাটিয়ে এদের খাঁটি খৃষ্টান করা কি কোনদিন সম্ভব হবে? একজন সপ্রতিভ ফাদার চটপট জবাব দিলেন ঃ খাঁটি খৃষ্টান হয়ত এদের কোনদিন করতে পারব না। কিন্তু খাঁটি ভারতবিরোধী যে তৈরি করতে পারবই এতে কোন সন্দেহ নেই। এই কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্য্যপূর্ণ। খৃষ্টানী বিচ্ছিন্নতার ক্রমবর্ধমান সম্প্রসারণ দেখে এ সত্য অনুভব করা যায়। উত্তর পুর্বাঞ্চলের ষড়যন্ত্র এখন ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের নামে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত। এখনই এই সম্প্রসারণবাদটি সম্পর্কে সতর্ক সচেতন হয়ে

প্রতিরোধে না নামলে একদিন এরজন্য অনেক মূল্য দিতে হবে। দান, সেবা এবং চিকিৎসার নামে এরা সোজাসুজি ধর্মান্তর করে। গ্রামের দরিদ্র অজ্ঞ হিন্দুদের বড় অংশটা সরকারী পরিভাষায় তফশিলী আদিবাসী। জাতপাতের রাজনীতিওয়ালাদের কাছে ভোটের খাদ্য। পিছিয়ে পড়া মানুষদের কল্যাণকামী মাননীয় কাঁশীরাম যাদের নিত্য আহ্বান জানাচ্ছেন ধর্মান্তরিত হবার জন্য। খৃষ্টান ধর্মের প্রচারকেরা গম-দুধ-জামাকাপড় ইত্যাদির বিনিময়ে দুর্বল করে তাদের খৃষ্টান করে। অভিলাষকে অলিভার, গণেশকে গোমেশ, কেষ্টকে কষ্টা, পটলকে রূপান্তরিত করা হয় পিটারে। এই পিটার, কষ্টা, গোমেশ, অলিভারদের সংখ্যা বাড়লেই নাগাল্যাণ্ড, মিজোরাম, ত্রিপুরা, ঝাড়খণ্ড। অর্থাৎ দেশকে খণ্ড খণ্ড করার আসল কাজ। দেশের সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবি, রাজনৈতিক নেতারা এ বিষয়ে শুধু নির্বাক থাকে না। এদের বিরুদ্ধে আইন পাশের চেষ্টা হলে এরা বাধা দেয়। ১৯৭৮ সালে জনতা সরকারের আমলে পার্লামেন্টে একটি বিল আসে। ওমপ্রকাশ ত্যাগী বিলটি উত্থাপন করেন। ধর্মীয় স্বাধীনতার বিল। বিলের মোদ্দা কথাটা ছিল প্রলোভন কিম্বা অত্যাচারে কেউ কাউকে ধর্মান্তরিত করতে পারবে না। খ্রীষ্টীয় সাম্রাজ্যবাদের এজেন্ট টেরেসার আসল রূপটি দেখিয়ে দিল এই বিল। রাস্তায় মিছিল করে বিক্ষোভ দেখাল খ্রীষ্টানেরা। টেরেসা প্রধানমন্ত্রী মোরারজীভাইকে ধমক দিয়ে এলেন। এই বিল পাশ করলে আপনাকে নরক দর্শন করতে হবে। আর জর্জ ফার্ণাণ্ডেজ সকলকে একত্রিত করে মোরারজী সরকারের পতন ঘটিয়ে দিলেন। এই নোংরা খ্রীষ্টান রাজনীতির কথা সাহস করে অন্যপক্ষও বলতে পারলেন না। অনেকেই অর্থানুকূল্য না পেলেও ভয় পেলেন টেরেসার ইমেজকে। ভারতে খ্রীষ্টধর্মের গতি প্রায় রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। টেরেসা নতুন গতি দিয়েছেন তাতে। খ্রীষ্টান আন্তর্জাতিক চেইন টেরেসাকে নোবেল পুরস্কার দিয়েছে। প্রকৃত কারণ না জেনে মুক্তকচ্ছ হয়ে গেল অধিকাংশ মানুষ। ভারত সরকার ভারতরত্ন দিয়ে নিজের কফিনে নিজেই পেরেক মেরে দিয়েছেন। সর্বনাশকে সাজিয়ে দিয়েছেন গৌরবরূপে। সংবাদজগতের মুখ একই কারণে বাঁধা। ডলারের কৃতজ্ঞতা বিভিন্ন ফাউণ্ডেশনের দৌলতে বিদেশ ভ্রমণ তো ছিল এবং আছে। এছাড়া আছে আছে আগে থেকে জননী টেরেসা, মা, মাদার

বলে বগল বাজাবো। তাই তাদের ভূমিকা যা হওয়া উচিত তাই হচ্ছে। টেরেসা এদেশের কাগজে অকারণে প্রায় প্রাত্যহিক সংবাদ। ভারতবিরোধী কাজে কতজন ফাদারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, ভারত থেকে বিতাড়িত করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। সরকারী আদেশ উপেক্ষা করে তাদের মধ্যে কতজন ভারতে রয়ে গেছে এঁরা সেকথা লিখতেও পারেন না। মাইকেল স্কট, ফাদার ফেরার, ডিসুজার মত অসংখ্য দেশদ্রোহীদের মার্গ্যকলাপ এঁরা ভুলেও বলেন না। সাহিত্য-নাটক-সিনেমা জগতটির মধ্যেও খ্রীষ্টীয় সম্প্রসারণবাদের ছায়া ক্রমশ প্রলম্বিত হচ্ছে। খ্রীষ্টান চরিত্র থাকলে সে মহান হবেই। নায়ক এ্যালবার্ট ডেভিড কিম্বা মাইকেল হলে তার সাহস, মহত্ব হবে আকাশছোঁয়া। কথায় কথায় সে বুকে ক্রশ আঁকবে, আমেন বলবে। গীর্জার দৃশ্য, ঘণ্টাধ্বনি থাকবে। খ্রীষ্টধর্মে আকৃষ্ট করার জন্য সবরকম উপকরণ থাকবে। বিভিন্ন দিক থেকে এত আটঘাট বেঁধে এই সাম্রাজ্যবাদটি তার মুখ ব্যাদান করেছে যে খাদ্য বুঝতেই পারছে না। সে একটি নিখুঁত ষড়যন্ত্রের জঠরে প্রবেশ করে তার অস্তিত্বই হারিয়ে ফেলছে। ধর্মের নামে যে মতবাদটি সাম্রাজ্যবাদের হাতিয়াররূপে কাজ করে যাচ্ছে, যাদের সমাজের মোহমুক্ত শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদেরা প্রকৃত সত্য জানিয়ে গেছেন, সেই খ্রীষ্টীয় দর্শনের ভেতরের খবরটিও অনেকের অজানা। বাইবেলে আদৌ কোন সত্য আছে কিনা সে বিষয়েও এতদ্দেশীয় পণ্ডিতেরা নীরব। প্রচারে প্রভাবিত হয়ে এদিকে ধর্ম-দর্শন-প্রেম-মৈত্রীর দ্যোতক বলে মনে করেন। এ বিষয়েও বাইবেলের গভীরে প্রবেশ একান্ত প্রয়োজন। শেষ থেকে শুরুর মত এটা যীশুর মৃত্যু দিয়ে আরম্ভ করা যেতে পারে। দ্বিতীয় প্রহরের পর ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় যীশুখ্রীষ্ট চীৎকার করে বললেন এলি এলি লামা শবক্তানি। অর্থাৎ হে ঈশ্বর তুমি আমায় কেন পরিত্যাগ করলে? যারা সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল তাদের একজন একখণ্ড স্পঞ্জ জাতীয় বস্ত্র দ্রাক্ষারসে ভিজিয়ে যীশুকে পান করালেন। তারপরই তিনি একবার চীৎকার করে প্রাণত্যাগ করলেন। বাইবেলের এই অংশটুকু অনেকের জানা। এখানেই তো একটি অমোঘ প্রশ্ন উঠে আসে। যীশু যদি সত্য ঈশ্বরের পুত্র হতেন তাহলে তিনি ঈশ্বরের মত ত্রিকালদর্শী হতেন। তিনি জানতে পারতেন যে তারই এক বিশ্বাসঘাতক শিষ্য তাকে ধরিয়ে দেবে এবং তিনি নিহত

প্রতিরোধে না নামলে একদিন এরজন্য অনেক মূল্য দিতে হবে। দান, সেবা এবং চিকিৎসার নামে এরা সোজাসুজি ধর্মান্তর করে। গ্রামের দরিদ্র অজ্ঞ হিন্দুদের বড় অংশটা সরকারী পরিভাষায় তফশিলী আদিবাসী। জাতপাতের রাজনীতিওয়ালাদের কাছে ভোটের খাদ্য। পিছিয়ে পড়া মানুষদের কল্যাণকামী মাননীয় কাঁশীরাম যাদের নিত্য আহ্বান জানাচ্ছেন ধর্মান্তরিত হবার জন্য। খৃষ্টান ধর্মের প্রচারকেরা গম-দুধ-জামাকাপড় ইত্যাদির বিনিময়ে দুর্বল করে তাদের খৃষ্টান করে। অভিলাষকে অলিভার, গণেশকে গোমেশ, কেষ্টকে কষ্টা, পটলকে রূপান্তরিত করা হয় পিটারে। এই পিটার, কষ্টা, গোমেশ, অলিভারদের সংখ্যা বাড়লেই নাগাল্যাণ্ড, মিজোরাম, ত্রিপুরা, ঝাড়খণ্ড। অর্থাৎ দেশকে খণ্ড খণ্ড করার আসল কাজ। দেশের সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবি, রাজনৈতিক নেতারা এ বিষয়ে শুধু নির্বাক থাকে না। এদের বিরুদ্ধে আইন পাশের চেষ্টা হলে এরা বাধা দেয়। ১৯৭৮ সালে জনতা সরকারের আমলে পার্লামেন্টে একটি বিল আসে। ওমপ্রকাশ ত্যাগী বিলটি উত্থাপন করেন। ধর্মীয় স্বাধীনতার বিল। বিলের মোদ্দা কথাটা ছিল প্রলোভন কিম্বা অত্যাচারে কেউ কাউকে ধর্মান্তরিত করতে পারবে না। খ্রীষ্টীয় সাম্রাজ্যবাদের এজেন্ট টেরেসার আসল রূপটি দেখিয়ে দিল এই বিল। রাস্তায় মিছিল করে বিক্ষোভ দেখাল খ্রীষ্টানেরা। টেরেসা প্রধানমন্ত্রী মোরারজীভাইকে ধমক দিয়ে এলেন। এই বিল পাশ করলে আপনাকে নরক দর্শন করতে হবে। আর জর্জ ফার্ণাণ্ডেজ সকলকে একত্রিত করে মোরারজী সরকারের পতন ঘটিয়ে দিলেন। এই নোংরা খ্রীষ্টান রাজনীতির কথা সাহস করে অন্যপক্ষও বলতে পারলেন না। অনেকেই অর্থানুকূল্য না পেলেও ভয় পেলেন টেরেসার ইমেজকে। ভারতে খ্রীষ্টধর্মের গতি প্রায় রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। টেরেসা নতুন গতি দিয়েছেন অতে। খ্রীষ্টান আন্তর্জাতিক চেইন টেরেসাকে নোবেল পুরস্কার দিয়েছে। প্রকৃত কারণ না জেনে মুক্তকচ্ছ হয়ে গেল অধিকাংশ মানুষ। ভারত সরকার ভারতরত্ন দিয়ে নিজের কফিনে নিজেই পেরেক মেরে দিয়েছেন। সর্বনাশকে সাজিয়ে দিয়েছেন গৌরবরূপে। সংবাদজগতের মুখ একই কারণে বাঁধা। ডলারের কৃতজ্ঞতা বিভিন্ন ফাউণ্ডেশনের দৌলতে বিদেশ ভ্রমণ তো ছিল এবং আছে। এছাড়া আছে আছে আগে থেকে জননী টেরেসা, মা, মাদার

বলে বগল বাজাচ্ছে। তাই তাদের ভূমিকা যা হওয়া উচিত তাই হচ্ছে। টেরেসা এদেশের কাগজে অকারণেই প্রায় প্রাত্যহিক সংবাদ। ভারতবিরোধী কাজে কতজন ফাদারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, ভারত থেকে বিতাড়িত করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। সরকারী আদেশ উপেক্ষা করে তাদের মধ্যে কতজন ভারতে রয়ে গেছে এঁরা সেকথা লিখতে পারেন না। মাইকেল স্কট, ফাদার ফেরার, ডিসুজার মত অসংখ্য দেশদ্রোহীদের কার্যকলাপ এঁরা জেনেও বলেন না। সাহিত্য-নাটক-সিনেমা জগতটির মধ্যেও খ্রীষ্টীয় সম্প্রসারণবাদের ছায়া ক্রমশ প্রলম্বিত হচ্ছে। খ্রীষ্টান চরিত্র থাকলে সে মহান হবেই। নায়ক এ্যালবার্ট ডেভিড কিম্বা মাইকেল হলে তার সাহস, মহত্ব হবে আকাশছোঁয়া। কথায় কথায় সে বুকে ক্রুশ আঁকবে, আমেন বলবে। গীর্জার দৃশ্য, ঘণ্টাধ্বনি থাকবে। খ্রীষ্টধর্মে আকৃষ্ট করার জন্য সবরকম উপকরণ থাকবে। বিভিন্ন দিক থেকে এত আটঘাট বেঁধে এই সাম্রাজ্যবাদটি তার মুখ ব্যাদান করেছে যে খাদ্য বুঝতেই পারছে না। সে একটি নিখুঁত ষড়যন্ত্রের জঠরে প্রবেশ করে তার অস্তিত্বই হারিয়ে ফেলছে। ধর্মের নামে যে মতবাদটি সাম্রাজ্যবাদের হাতিয়াররূপে কাজ করে যাচ্ছে, যাদের সমাজের মোহমুক্ত শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদেরা প্রকৃত সত্য জানিয়ে গেছেন, সেই খ্রীষ্টীয় দর্শনের ভেতরের খবরটিও অনেকের অজানা। বাইবেলে আদৌ কোন সত্য আছে কিনা সে বিষয়েও এতদ্দেশীয় পণ্ডিতেরা নীরব। প্রচারে প্রভাবিত হয়ে এটিকে ধর্ম-দর্শন-প্রেম-মৈত্রীর দ্যোতক বলে মনে করেন। এ বিষয়েও বাইবেলের গভীরে প্রবেশ একান্ত প্রয়োজন। শেষ থেকে শুরুর মত এটা যীশুর মৃত্যু দিয়ে আরম্ভ করা যেতে পারে। দ্বিতীয় প্রহরের পর ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় যীশুখ্রীষ্ট চীৎকার করে বললেন এলি এলি লামা শবক্তানি। অর্থাৎ হে ঈশ্বর তুমি আমায় কেন পরিত্যাগ করলে? যারা সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল তাদের একজন একখণ্ড স্পঞ্জ জাতীয় বস্তু দ্রাক্ষারসে ভিজিয়ে যীশুকে পান করালেন। তারপরই তিনি একবার চীৎকার করে প্রাণত্যাগ করলেন। বাইবেলের এই অংশটুকু অনেকের জানা। এখানেই তো একটি অমোঘ প্রশ্ন উঠে আসে। যীশু যদি সত্য ঈশ্বরের পুত্র হতেন তাহলে তিনি ঈশ্বরের মত ত্রিকালদর্শী হতেন। তিনি জানতে পারতেন যে তারই এক বিশ্বাসঘাতক শিষ্য তাকে ধরিয়ে দেবে এবং তিনি নিহত

হবেন। যীশু স্বীকার করেছেন ঈশ্বর তাঁকে শেষ পর্যন্ত পরিত্যাগ করেছেন। তিনি যে ঈশ্বরের পুত্র এটা যীশুর নিজের উক্তি ছাড়া আর কোন প্রমাণ নেই। একথায় বিশ্বাস করলে তাঁর শেষ কথাটিও মানতে হয় যে তিনি ঈশ্বরের পরিত্যক্ত পুত্র। পিতা যদি পুত্রকে ত্যাগ করে সেই ত্যাজ্যপুত্রের পিতার সম্পত্তিতে কোন অধিকার থাকে না। তাহলে যীশু স্বর্গে প্রবেশের অধিকার পাবেন কি করে? তাঁর অনুগামী খ্রীষ্টানের জন্য তিনি স্বর্গে স্থানই বা সংরক্ষণ করবেন কি করে? এসব প্রশ্নের কোন উত্তর নেই। এবার মৃত্যুপর্ব থেকে জন্মসূত্রে আসা যেতে পারে। যীশুর মা মেরী ছিলেন যোসেফের বাগদত্তা। বিবাহের আগে শরীরি সম্পর্কের দ্বারাই মেরী সন্তানবতী হলেন। খুব সরলভাষায় যীশু অবৈধ সন্তান বা কুমারী মায়ের সন্তান। এতে অবশ্যই যীশুর কোন হাত নেই, অপরাধও নেই। কিন্তু খৃষ্টানেরা মহিমা বাড়াবার জন্য এটাকে গল্প দিয়ে জাস্টিফায়েড করে দিল। প্রভুর এক দূত স্বপ্নে বলল যোসেফ মেরীকে গ্রহণ করতে ভয় পেও না। তার গর্ভে যা আছে সেটা পবিত্র আত্মা থেকে হয়েছে। ঈশ্বরের কৃপায় কোন কুমারী গর্ভবতী হয় না। চিকিৎসা শাস্ত্রেও এ যুক্তি টেকে না। বাইবেল শুরুই হয়েছে গালগল্প দিয়ে। মানবসৃষ্টি, পৃথিবী সৃষ্টির উৎসটিতেও এই অবৈজ্ঞানিক চিন্তা। ঈশ্বর আকাশমণ্ডল এবং পৃথিবী সৃষ্টি করলেন। পৃথিবী শূন্য এবং অন্ধকার জলধির ওপর ছিল আর ঈশ্বরের আত্মা জলের ওপর অবস্থান করছিল। ঈশ্বরের আত্মা যখন জলের ওপর তখন তাঁর দেহটি কোথায় ছিল? ঈশ্বর যে বিশ্বসৃষ্টি করলেন তা তাঁর নিজের সত্তা থেকে বাইরে করেছেন। তাঁর তখনকার অবস্থান কোথায় ছিল? অবশ্য বাইবেলে আছে সাড়ে সাতশো ক্রোশ দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও উচ্চতাযুক্ত স্থান আছে তার নাম স্বর্গ। সেটাই ঈশ্বরের আদি নিবাস। আবার প্রশ্ন জাগে তাহলে এটা কে বানিয়েছিল? যদি এটাও ঈশ্বর বানিয়ে থাকেন তাহলে তার আগে তিনি কোথায় ছিলেন? এসব প্রশ্ন তুললে খৃষ্টানরা আর খৃষ্টান থাকে না হিদেন হয়ে যায়, পাপী হয়ে যায়। আলো [illegible] বানাবার পর তিনি সব উত্তম দেখলেন। সৃষ্টির পর তিনি জানলেন আলো ভালো জিনিষ। তার মানে এর আগে আলো সম্পর্কে তাঁর কোন জ্ঞান ছিল না। এইসব ছোট ছোট ঘটনায় নিশ্চয়ই জানা যায় বাইবেলে বর্ণিত ঈশ্বর সর্বজ্ঞ নন। তিনি নিজে বিভ্রান্ত তাঁর

কথিত বাইবেল অনুসৃত হয় কি করে? ঈশ্বর ধুলোমাটি দিয়ে আদি মানব আদমকে তৈরি করে তার নাকে ফুঁ দিয়ে জীবিত করে দিলেন। ঈশ্বর নাকে ফুঁ দিয়ে প্রমাণ করলেন তাঁর মুখ আছে, বুক আছে, ফুসফুস আছে এবং তাতে প্রাণবায়ু আছে। তার মানে এই ঈশ্বর মানুষের মতই অবয়বযুক্ত। তাহলে আবার প্রশ্ন, আদমের দেহ যেমন জরা-মৃত্যু-বিকারশীল ঈশ্বরও কি তাই? উত্তর নেই। তারপর সদাপ্রভু আদমকে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন। আদম ঘুমিয়ে পড়লে ঈশ্বর তার বুকের একখানা পাঁজর খুলে নিয়ে একটি মেয়ে তৈরি করলেন। তার নাম দিলেন ইভ্। ঈশ্বর যদি ধূলোমাটি দিয়ে আদমকে সৃষ্টি করতে পারেন তাহলে ইভ্‌কেও তো ঐভাবে নির্মাণ করতে পারতেন। পাঁজর খুলে ঝুঁকি নিতে গেলেন কেন? আদমের বুকের একখানা পাঁজর খুলে নেবার কারণে পুরুষের বুকের একদিকের একটি হাড় কম এই ধারণা বহু বছর ধরে লালিত হয়েছে খৃষ্টান সমাজে। মাত্র দু'শো বছর আগে এই ধারণা পাল্টেছে। তাহলে বাইবেলে নতুন করে লেখা উচিত যে সদাপ্রভু দুদিক থেকে দুখানা হাড় নিয়েছিলেন অথবা এটি আর একটি গুল্প। অর্থাৎ গুল এবং গল্প মাত্র। মনে হয় জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়ার যে ঘটনাটি বাইবেলের মধ্যে তা খুবই অর্থবহ। জ্ঞান হওয়া মানেই যুক্তিবুদ্ধির প্রয়োগ। খৃষ্টানরা যেটা চায় না। কোন সেমেটিক ধর্মীয়গোষ্ঠীই চায় না। বাইবেলের ঈশ্বরও চাননি তাঁর সৃষ্ট মানুষ জ্ঞানলাভ করুক। স্বর্গোদ্যানের সেই সাপটির কাছেই মানবসমাজের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। কারণ সেই সাপটিই আদম এবং ইভ্‌কে উদ্বুদ্ধ করেছিল এই বলে: ঈশ্বর তোমাদের মিথ্যাকথা বলেছেন, ঐ ফল খেলে মরে যাবে। আমি বলছি। তোমাদের কিছু হবে না, তোমরা মরবে না। এই ফল খেলে তোমাদের চোখ খুলে যাবে সৎ অসৎ জ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে ঈশ্বর সদৃশ হবে। মেয়েটি ফল খেয়ে আদমকেও দিল। দুজনেরই আত্মজ্ঞান হলো, তারা নগ্ন। এই ঘটনায় একটি সত্য উদ্ধার হলো, বাইবেলের ঈশ্বর জ্ঞানচর্চার বিরুদ্ধে। এরজন্য তিনি মিথ্যেকথা বলতেও প্রস্তুত। উদ্দেশ্য, যাতে মানুষ জ্ঞান সংগ্রহে বিরত থাকে। ঈশ্বরের ভয়ও আছে, জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হলে তাঁকে অস্বীকার করতে পারে ভবিষ্যতের যুক্তি সচেতন মানুষ। খৃষ্টধর্মের মানুষেরা এ বিষয়ে যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনায় আগ্রহী নন, কারণ তাতে জ্ঞান হবে এবং

জ্ঞান হলেই তারা বুঝতে পারবে ধর্মের নামে তারা যা করে চলেছে তা নগ্ন সাম্রাজ্যবাদ ব্যতীত কিছুই নয়। তাই আদম এবং ইভ্ জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়া সদাপ্রভু ক্রুদ্ধ হয়ে গেলেন। সাপকে তিনি অধিক শাপগ্রস্ত করলেন। ইভ্‌কে বললেন, আমি তোমার গর্ভযন্ত্রণা বৃদ্ধি করলাম, তুমি প্রচণ্ড বেদনায় সন্তান প্রসব করবে। আদমকে বললেন, তুমি আমার কথা শোননি, স্ত্রীর কথা শুনে তুমি ফল খেয়েছ, তাই তোমার জন্য ভূমি অভিশপ্ত হলো। সারাজীবন তুমি কষ্টভোগ করবে। এইরকম ঈশ্বরের অনুগামীরা যা হতে পারে তাই হয়েছে। দু দুটি মহাযুদ্ধ বাধিয়ে ভূমি অভিশপ্ত মানবজীবন ক্লেশকর করেছে এরাই। আজও মানবজাতির অস্তিত্ব বিপন্ন করে তোলে দুটি সেমেটিক ধর্ম-ইসলাম এবং খৃষ্টান। যারা আদৌ ধর্মের কাছাকাছি নেই। অথচ তাদের ধর্মেই সুন্দর বিশ্বমানবতার পরকাল লাগানো। মানবতা, ভ্রাতৃত্ব, সমতা শব্দগুলো এরাই ব্যবহার করে বেশি। নিজেদের উপসম্প্রদায়গুলির সঙ্গেও যারা সহাবস্থান করতে পারে না। শিয়া-শুন্নির মত প্রোটেষ্ট্যান্ট-ক্যাথলিকে লড়াই সর্বজনবিদিত। এই যে আগ্রাসী আক্রমণাত্মক মনোভাব এর উৎসও কিন্তু খৃষ্টানদের আকরগ্রন্থ বাইবেল এবং এই ধর্মীয় মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা প্রেমময় যীশু। তিনি বলেছেন ঃ তোমরা মনে কর না যে আমি পৃথিবীতে মিলন ঘটাতে এসেছি। আমি তলোয়ার চালাতে এসেছি। আমি এসেছি বাপের সঙ্গে ছেলের, মায়ের সঙ্গে মেয়ের, শাশুড়ীর সঙ্গে পুত্রবধূর বিচ্ছেদ ঘটাতে। আমি চাই আপন পরিজনরাই হবে মানুষের শত্রু। মার্কের দিব্য প্রকাশে যীশু আরো স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন ঃ তাকিয়ে থাকলে স্বর্গরাজ্য আসবে না। আমি এসেছি পৃথিবীতে আগুন দিতে। তোমরা কি ভাবছ আমি এখানে শান্তি দিতে এসেছি? না, আমি এসেছি বিরোধ সৃষ্টি করতে। মথি লিখিত সুসমাচারে বলেছেন ঃ ভেবোনা আমি পৃথিবীতে স্বস্তি দিতে এসেছি। আমি এসেছি তরবারী দিতে। শেষ ভোজে বলেছেন যার তরবারী নেই সে যেন তার পরিচ্ছদ বিক্রী করে তরবারী কেনে। এইসব উদ্ধৃতির প্রতিটি শব্দ খৃষ্টীয় গ্রন্থ থেকে। ভালো করে আকর গ্রন্থটি পড়া, খোলা মনে তার বিচার বিশ্লেষণ করে সত্যকে উপলব্ধি করার এই একটিই পথ। প্রচার মহিমায় মুগ্ধ হয়ে যুক্তি বাদ দিয়ে শুধু ভক্তি দিয়ে খৃষ্টীয় মতবাদকে গ্রহণ

করতে গিয়ে সত্য থেকে বিচ্যুত হয়েছে পৃথিবীর বহু মানুষ। অবশ্য এখন ইউরোপ আমেরিকার বহু বিদগ্ধ ব্যক্তি জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাচ্ছেন। একালে জ্ঞানবৃক্ষের ফল মানে-বেদ-উপনিষদ-গীতা। এগুলো গৃহীত হয়ে মুগ্ধতা কেটে যাচ্ছে, মোহমুক্তি ঘটছে, ঘটাই তো উচিত। যারা জ্ঞানে-বিজ্ঞানে উন্নত তারা ক্রমশঃ লজিক্যাল, র‍্যাশনাল, সত্যসন্ধানী হয়ে উঠবেই। ভূত, প্রেত, ঝাড়ফুঁক, তুকতাক, মন্ত্র পড়ে স্পর্শ করে রোগ সারানো, মরা বাঁচনো এগুলো অজ্ঞ, অন্ধ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন মনের ফসল। সভ্য মানুষের কাছে এগুলো ব্যঙ্গের বিষয়। এই কাজ যীশু যে কত শতবার করেছেন তা বাইবেল পড়লেই মালুম হয়ে যায়। তাই যুক্তিবাদী পাশ্চাত্য বেদান্তবাদী হয়ে উঠে বাইবেল পরিত্যাগ করবে এটাই স্বাভাবিক। প্রশ্ন জাগছে যে যীশুর শরণ না নিলে উদ্ধারের কোন আশা নেই একথা সত্য হলে যীশু জন্মাবার আগের লক্ষ কোটি মানুষের মুক্তিবিধান করবে কে? যীশুর সাক্ষাৎ শিষ্য বারোজনের মধ্যে একজন মাত্র ত্রিশটা মুদ্রার লোভে তাঁকে ধরিয়ে দিল আর বাকীরা তাদের মত পরিবর্তন করে যে যেখানে পারল পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচাল। যিনি তাঁর হাতে তৈরি শিষ্যদের ধরে রাখতে পারলেন না, তাঁর আশ্রয় নিলে পাপমোক্ষণ হবে, উদ্ধার হবে একথায় বুদ্ধিমান মানুষ বিশ্বাস করে না। ইওরোপ আমেরিকায় খৃষ্টধর্ম এবং বাইবেলে অবিশ্বাস ক্রমবর্ধমান দেখে খৃষ্টীয় সাম্রাজ্যবাদ সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে এশিয়া, আফ্রিকায়। ১৯৭৭ সালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধনিকলাল মণ্ডলের রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, ইংরেজ পরিচালিত পরাধীন ভারতে যে খৃষ্টান সক্রিয়তা ছিল এখন চলছে তার দ্বিগুণেরও বেশি। পৃথিবীর এমন কোন খৃষ্টান দেশ নেই যারা ভারতবর্ষকে খৃষ্টরাজ্য করার জন্য টাকা এবং মিশনারী পাঠায়না। এ ব্যাপারে ধনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র একাকার। খৃষ্টীয় ষড়যন্ত্রে সবাই সমান অংশীদার। আমেরিকার সঙ্গে হাত মিলিয়ে এক সাথে কাজ করে হাঙ্গেরী, চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগশ্লোভিয়া। ৭৭ সালের হিসাবে ভারতে বিদেশী মিশনারীর সংখ্যা ছিল ৩৭৩২, ব্ল্যাক ফাদার কালো বাবা মানে স্থানীয় প্রচারক আছে এর চতুর্গুণ। এদের কাজের সুবিধের জন্য এরা ভারতবর্ষকে ১০৭টি ভাগে ভাগ করে নিয়েছে। এক একটি খৃষ্টান রাষ্ট্রকে তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী ক্ষেত্র দেওয়া হয়েছে। তারা টাকা, মিশনারী, ওষুধপত্র, খাদ্য রোমান

ক্যাথলিক চার্চের হিসাব। এরপর আছে প্রোটেস্ট্যান্টদের কাজকর্ম। দুটি গোষ্ঠীই সমতুল শক্তিসম্পন্ন। হাজার হাজার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এরা ষড়যন্ত্রের জালবিস্তার করে চলেছে। শুধু মুখোশটি সেবা, শিক্ষা ও ধর্মের। তাই সরল জনগণ এদের সঠিক উদ্দেশ্য বুঝতে পারে না। ওপর চালাক অর্থাৎ লেখাপড়া জানা মানুষেরা এদের কাছাকাছি হতে ভালবাসে এবং যেতে পারলে বেশ আত্মপ্রসাদ লাভ করে। এদের কাছে পেয়ে খ্রীষ্টানদের পক্ষে হিন্দুসমাজের ধ্বংসসাধনে সুবিধা হয়। কারণ খৃষ্টানদের কাজ হলো এদের অতীতকে ঘৃণিত করে তুলে হিন্দুত্ব থেকে দূরে সরিয়ে আনা। বিবেকানন্দ পুরো পরিস্থিতি উপলব্ধি করে বলে গেছেন, খৃষ্টান শিশুদের প্রথম থেকে শেখানো হয় হিন্দুরা নীচ ঘৃণ্য এবং পৃথিবীতে তারাই ভয়াবহ শয়তান। শিশুদের শিক্ষার জন্য রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ে খৃষ্টান ছাড়া সকলকে বিশেষত হিন্দুদেরকে ঘৃণা করতে শেখানো হয়। মিশনারীরা আমাদের দেশে আসে আমাদের পূর্বপুরুষ আমাদের ধর্ম ও সমস্ত কিছুকে ঘৃণা ও তিরস্কার করতে। তারা মন্দিরের সামনে গিয়ে বলে যে সাকারবাদীর দল তোমরা নরকে যাবে। কিন্তু তারা ভারতে কোন মুসলমানদের কাছে যেতে সাহস করে না। তাহলে তরবারী বেরিয়ে আসতে পারে। এগুলো বিবেকানন্দের কথা। এখন তো হিন্দুধর্ম সম্পর্কে আরো নোংরা বিকৃত জিনিষ দেখানো হয়। সাম্প্রতিককালের ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন প্রখ্যাত পণ্ডিত বিমলকৃষ্ণ মতিলাল। দেশ পত্রিকায়। টরেন্টো স্কুলে প্রত্যেক রবিবার ধর্মশিক্ষার নামে হিন্দুধর্ম সম্পর্কে ভিডিও দেখানো হয়। দুর্গাপূজা, শিবের গাজন, গণেশের শোভাযাত্রা প্রভৃতি বাহ্যিক দিকগুলো দেখিয়ে বলে দেখ দেখ কি নির্বোধদের ধর্ম। হাতির শুঁড় হলো দেবতা, রক্তজিহ্বা কালী দুর্গা এরা হলো দেবী আর আদিবাসীদের মত নাচগান হল্লাকে বলা হয় ধর্ম। আশ্চর্য্যের কথা এইসব অনুষ্ঠানে বহু হিন্দু ছাত্রছাত্রী থাকে। তবে তারা বেশিদিন হিন্দু থাকতে পারে না। তাই বিবেকানন্দ এদের সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন এবং ধর্মান্তর সম্বন্ধে বিশেষভাবে হিন্দুদের বলেছেন ঃ হিন্দুসমাজ থেকে একজন চলে যাবার অর্থ একজন শত্রু সৃষ্টি হওয়া। মিশনারীদের কথায় কর্ণপাত করো না। এটা খুবই স্বাভাবিক যে তারা চীৎকার করবে। রুটির প্রশ্ন এলে কে না করে? এসব কথার প্রত্যেকটি শব্দ

বিবেকানন্দের। তাঁর রচনাবলীর বিক্রয় সংখ্যা কম নয়, বহু বাড়ীর আলমারীতে সাজানো আছে। বিশেষ করে রামকৃষ্ণ মিশনের ভক্ত-শিষ্যদের বাড়ীতে। তাঁরা কেউ সে গ্রন্থ উল্টে দেখেন না। মিশনের মন্দিরে বাইবেলের শুভ্র অংশগুলি পাঠ করা হয়। মারাত্মক অংশগুলি আড়াল করা হয়। এটাই স্বাভাবিক। পৃথিবীতে নির্বোধ, পাগল আর ব্রহ্মজ্ঞানীদের কোন সমস্যা থাকে না। এদেশের হিন্দুদের একটা বড় অংশ এই তিনটি বস্তুর কম্পাউণ্ড। বুদ্ধিজীবিরা আর একটি উপাদানে সমৃদ্ধ, তার নাম স্বার্থান্বেষণ। এর ফলে তাঁরা শত্রুকে মিত্র বলেন, ষড়যন্ত্রকারীকে বলেন কল্যাণকারী। টেরেসাকে জীবন্ত দেবী প্রতিমার মহিমা দিয়েছেন এরাই। ত্রিপুরায় হাজার হাজার হিন্দু নিহত হয়েছিল উপজাতি খৃষ্টানদের হাতে। যে টেরেসা সেবা এবং সহানুভূতির পশরা নিয়ে আজ মাদাগাস্কার কাল আদিসআবাবা চলে যান। তিনি ত্রিপুরার ব্যাপারে কোন কথা বলেননি। কলেজ ষ্ট্রীটের এক তরকারী বিক্রেতা বিবাহের জন্য টেরেসা সৃষ্ট নির্মল হৃদয় প্রতিষ্ঠানে আবেদন জানালো, একটি অনাথিনী মেয়ে দিন আমি তাকে সংসারে প্রতিষ্ঠা দিতে চাই। নির্মল হৃদয় থেকে বেরিয়ে এলো একটি কুৎসিত মুখ। উত্তর এলো মেয়ে দিতে পারি, তোমাকে খৃষ্টান হতে হবে। এ ঘটনা সংবাদপত্রে প্রকাশিত। বুদ্ধিজীবি এবং রাজনীতি ব্যবসায়ীদের যে সিণ্ডিকেটটি এদেশে আছে যাঁরা মনে করেন সব শুভঙ্কর চিন্তার তারাই রক্ষক। মাফিয়া দৌরাত্মের মত যাদের সব বিষয়ে বিবৃতির দাপাদাপি জনগণকে সহ্য করতে হয় তারা এ ব্যাপারে কোথায় থাকেন কে জানে। একটি স্বাধীন দেশের বুকে বসে সেবার নামে ধর্মান্তর, গোত্রান্তর, রাষ্ট্রদ্রোহ, বিচ্ছিন্নতাবাদের বুদ্ধিকে কোন সম্বিত সৃষ্টি করে না। ব্যতিক্রমী সাংবাদিক হলধর পটল লিখেছেন, সেবার সঙ্গে শর্ত থাকলে সেবার আসল অর্থ থাকে কি। মৃত্যুপথযাত্রীর সেবা করার উদ্দেশ্য যদি হয় মৃত্যুর পর মৃতের সম্পত্তি লুটে নেবার অধিকার তাহলে সেই স্বার্থপর সেবাকে আমরা সেবা বলব কিনা। নিশ্চয়ই সবাই বলবেন এটা সেবার নামে ধাপ্পাবাজী। সেবা নিঃস্বার্থ হবে। স্বার্থ সম্পর্কিত সেবাকে বলে পরিষেবা বা চাকুরী। মাদার টেরেসার সেবা নিঃস্বার্থ নয়। মাদার টেরেসার মোট ১৬৪টি শাখার মধ্যে ১০৩টি ভারতে রয়েছে। অধিকাংশ উত্তরপূর্ব সীমান্ত রাজ্যগুলিতে। এই

শাখাগুলি ধর্মান্তরকরণের কাজেই যুক্ত। অর্থাৎ আর্ত মানুষকে সেবা দিয়ে ভুলিয়ে খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করাই মূল উদ্দেশ্য। মাদার টেরেসা জন্মনিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন। ধর্মীয় স্বাধীনতার বিল যখন লোকসভায় ১৯৭৮ এ এসেছিল এই মাদার টেরেসা তার প্রতিবাদে বলেছিলেন, "ইচ্ছামত ধর্ম পরিবর্তন না করতে পারলে তার কোন স্বাধীনতাই থাকে না।" তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই মাদারকে চিঠি দিয়ে বলেছিলেন, "ধর্ম পরিবর্তন ও সেবা একসঙ্গে চলতে পারে না।" সুতরাং মাদার টেরেসা চালান খৃষ্টান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, সেবা প্রতিষ্ঠান নয়। সেবিকার আড়ালে পরিবার পরিকল্পনার বিরুদ্ধে বাধাদানকারীণী ও ধর্মান্তরকরণে বিশেষ আগ্রহী এই মাদার টেরেসা, কে না জানে এই ভারতের অধিবাসীদের খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করার জন্য কোটি কোটি টাকা আসে, সেই টাকা দিয়ে মিশনারী স্কুল, কলেজ, চিকিৎসালয়, চার্চ গড়ে ওঠে। আর যারা আমাদের ধর্মের লোকগুলোকে দারিদ্রের সুযোগে ধর্মান্তরী করতে যায় তাদের আমরা ফাদার মাদার বলি। আমাদের নাটকে সাহিত্যে অনেক ফাদার মাদার ভগবানের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে থাকেন। কারণ নাট্যকারেরা ঐধরণের ঈশ্বর প্রেরিত ফাদার মাদারদের চরিত্র সৃষ্টির জন্য মিশন থেকে গোপনে অর্থ বা খাতির পেয়ে থাকেন। ফলে জাতিদ্রোহ, ধর্মদ্রোহ আর দেশদ্রোহ সেবার আড়ালে লুকিয়ে থাকে। খৃষ্টানেরা আগে বাইবেল, ঠিক তার পিছনেই বন্দুক ও বেয়নেট পাঠায়। এটাই খৃষ্টান সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র। সেটা আফ্রিকাতেও যেমন সত্যি তেমনি সত্য ভারতেও।" সামান্য পুনরাবৃত্তি হলেও বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবির এই ইঙ্গিত প্রণিধানযোগ্য। এটাই খৃষ্টানদের প্রকৃত রূপ। এদের পূর্বসূরীরা থাকত বোম্বেটে জলদস্যুদের সঙ্গে। দিনেমার, ওলন্দাজ, পর্তুগীজ দস্যু সব। সঙ্গে থাকত পাদ্রীর দল। নদীতে ঘুরে বেরিয়ে লুট করত সম্পদ, নারীর সম্মান। হাতের মধ্যে ফুটো করে বেত ঢুকিয়ে হাজারে হাজারে যুবক যুবতী, বালক বালিকা নিয়ে চলে যেত জাহাজের খোলের মধ্যে ঢুকিয়ে। লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করত ক্রীতদাসরূপে এদের বন্দরে বন্দরে বিক্রী করে। পাদ্রীদের কাজ ছিল এদের বাইবেলের বয়েত শুনিয়ে মাথায় জর্ডনের জল বলে যে কোন জল ছিটিয়ে তাদের খৃষ্টান করা। জানি বিশ্বাস হবে না। সত্যকে গ্রহণ করতে গেলে যে আত্মশক্তির

দরকার তা এদেশের অনেক মানুষেরই নেই। ইতিহাস পড়ার যাদের উৎসাহ নেই, তারা ইতিহাস আশ্রিত তিনটি উপন্যাস পড়ে নিতে পারেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের—রাধা, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের—পদসঞ্চার, নীহাররঞ্জন গুপ্তের—অস্তি ভাগীরথী তীরে। উপন্যাস হলেও এগুলো সত্যের কাছাকাছি। পড়লে বোঝা যাবে অতীতে এবং বর্ত্তমানে খৃষ্টান চরিত্র একটুও পরিবর্তিত হয়নি। পদ্ধতি প্রকরণ বদল হয়েছে মাত্র। আগে ছিল বর্বরতা এখন স্থান গ্রহণ সূক্ষ্মতা। যার কার্য্যকারীতা অমোঘ, কিন্তু হাঙরের কামড়ের মত আক্রান্ত প্রথমে বুঝতেই পারবে না। ফ্রান্সিস জেভিয়ার যাকে সেন্ট জেভিয়ার বলা হয়, গণ্য করা হয় খৃষ্টান সন্তরূপে। তাঁর আত্মজীবনীতে আছে, আমি গোয়ায় খৃষ্টান ধর্মের প্রচার করতাম। যারা খৃষ্টান হতে অস্বীকার করত তাদের ঘরে ঢুকিয়ে শিকল তুলে দিয়ে আগুন লাগিয়ে দিতাম। শিশু নারীর মৃত্যুভীতিযুক্ত কান্না আমার কানে বীণার সুরের মত মনে হত। ইনি খৃষ্টান সাধু। এই সাধু একদিন কন্যাকুমারিকায় একটি রকে পায়চারী করেছিলেন। যে রকে বিবেকানন্দ মাঝে মাঝে ধ্যান করতেন এবং যেখানে বসে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ। ১৯৬২ সালে হঠাৎ হঠাৎ খৃষ্টানেরা ঐ রকে একটা ক্রস পুঁতে দিয়ে ঘোষণা করে দিল এর নাম সেন্ট জেভিয়ার স্কোয়ার। পরে যেখানে বিবেকানন্দ কেন্দ্র নামে বিশাল প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। খ্রীষ্টানেরা এখানে নানাভাবে উৎপাত করে চলেছে। একদল দাবি করছে ঐ স্থানটা কন্যাকুমারী নয় হবে কান্নিমেরী। কাছেই নীলাকলে একটা ভাঙা মন্দির ছিল, সেটা রাতারাতি গীর্জায় পরিণত করে দিল খ্রীষ্টানেরা। রীতিমত সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে সেটা হিন্দুরা উদ্ধার করেছিল। ১৯৬৪ সালে এক পোপ এসেছিলেন ভারতে। পোপের হাতে খ্রীষ্টান হওয়াটা খুব গৌরবের এই ধারণা দিয়ে বহু হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করার কথা ছিল। এখনতো হিন্দুরাও সচেতন, তারা পোপ এলে বিক্ষোভ দেখাবার সিদ্ধান্ত নিল বোম্বাইয়ে। এতে বেশ অস্বস্তি বোধ করলেন বোম্বের কার্ডিন্যাল। বিক্ষোভকারীদের নেতার কাছে গিয়ে তিনি বললেন, অনুগ্রহ করে আপনারা বিক্ষোভ দেখাবেন না, এতবড় একজন ধর্মীয় নেতা ভারতে আসছেন, বিক্ষোভ দেখানো শোভন হবে না। বিক্ষুব্ধ নেতাটি বললেন ঠিক আছে, কিন্তু আমরা তো ঘোষণা

করে দিয়েছি, জনে জনে বারণ করা সম্ভব নয়। আপনি সংবাদপত্রে একটা বিবৃতি দিয়ে দিন, বলুন ধর্ম সবই সমান, অতএব খ্রীষ্টান ধর্মের নেতা পোপকে আপনারা বিক্ষোভ দেখাবেন না। কার্ডিন্যাল বললেন, তা কি করে হয়। ধরুন আমি সাবান বিক্রী করতে এসেছি, আমি যদি বলি আমার সাবান অন্যদের সাবানের মতই কার্য্যকরী তাহলে আমার সাবান লোকে কিনবে কেন? এর অর্থ খ্রীষ্টান ধর্ম ধর্ম নয়, বিক্রয় এবং রপ্তানীযোগ্য বস্তু। এগুলো যারা প্রচার করে সেই পাদ্রী-নানেরা ধর্মপ্রচারক নন সেলসম্যান মাত্র। এ ঘটনা অনেকেই জানেন কিন্তু এর নির্গলিতার্থ বুঝতে পারেন না। দীর্ঘদিনের মানসিক দাসত্ব বহু মানুষকে প্রায় পশুতে পরিণত করে দিয়েছে। পশুর সঙ্গে মানুষের বিশেষ পার্থক্য নেই। য পশ্যতি স পশু। যে শুধু দেখতে পায় ভাবতে পারে না সেই পশু। তবু পশুদের একটা ইন্টিউশন থাকে, অনুভূতি থাকে, যা দিয়ে সে অনেক বিপদ আগে থেকে বুঝতে পারে। দাস মানসিকতায় আচ্ছন্ন মানুষদের না থাকে স্বজ্ঞা না প্রজ্ঞা। নিজে নিজে তো নয়ই কেউ বুঝিয়ে দিলেও বুঝতে পারে না। যে বোঝায় আক্রমণ করে তাকেই। ১৯৮৬ সালে মহামান্য পোপ জন পল ভারত ভ্রমণে এলেন। তখন ভারতে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী। যাঁর স্ত্রী সোনিয়া কট্টর ক্যাথলিক খ্রীষ্টান। ইলাস্ট্রেটেড উইকলি, অর্গানাইজারের মত দায়িত্বশীল পত্রিকায় লেখা হয়েছে বিবাহের সময় সোনিয়া রাজীবকেও ব্যাপ্টাইজ করিয়ে নাম রেখেছিল রবার্তো। এদের ছেলেমেয়েদের নিরাপত্তার জন্য ভর্তি করা হলো রাশিয়ার একটি অর্থডক্স চার্চ পরিচালিত স্কুলে। যেখানে খ্রীষ্টান ছাড়া ভর্তি করা হয় না। এ ঘটনাও সংবাদপত্রে এসেছে কিন্তু তলিয়ে দেখেনি অনেকেই। দেখলেও বিভ্রান্ত হয়েছে কপালে তিলক দেখে, হিন্দু পদ্ধতিতে শেষকৃত্য দেখে। এগুলো যে পলিটিক্যাল শো অনেকে ধরতেই পারেনি। জনতার নির্বুদ্ধিতা এবং নিজেদের ক্ষমতার শীর্ষে থাকার সুযোগ নিয়েছেন এরা পুরোপুরি। আগের কথায় আসা যাক। হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করার এবং ভারতবর্ষে খৃষ্টানধর্মের অনুকূলে আবহাওয়া নির্মাণের জন্য এদের আমন্ত্রণে পোপ এলেন। ধর্মীয় নেতারূপে নয় রাষ্ট্রপ্রধানরূপে। পোপ রাষ্ট্রপ্রধান ভ্যাটিকান সিটির। যার আয়তন মাত্র ১৯০ একর। জনসংখ্যা ১২ হাজার। ভ্যাটিক্যান ক্যাথলিক গীর্জার

কেন্দ্রীয় সম্পত্তি, তাও মুসোলিনীর দয়ায় পাওয়া। ৮০ কোটি মানুষের দেশ ভারতবর্ষে এই বারোহাজারী মনসবদারকে আনা জরুরী হয়ে পড়ল। ঘোরানো হল সারাদেশে। বিশেষভাবে খৃষ্টান অধ্যুষিত অঞ্চলে। কলকাতার সম্বর্ধনায় রাজ্য সরকারের ব্যয় হল নলক্ষ টাকা। হিন্দুদের সর্বনাশ করার জন্য এই মোচ্ছবে মোট খরচ হয় এগারো কোটি টাকা। পোপ সর্বত্র যীশুর বাণী শোনালেন। ব্যয়ভার বহন করল সরকার। পোপের হাতে থাকে স্বর্গের দরজার চাবিকাঠি। তিনি তালা না খুলে দিলে স্বর্গের দ্বার রুদ্ধ। গডের একমাত্র এজেন্ট। ধার্মিক এবং পবিত্র মানুষ। তিনি সর্বত্র প্রচার করলেন প্রেম এবং বিশ্বাসের বাণী। কিন্তু নিজে ঘুরলেন বুলেট প্রুফ গাড়ীতে। গড তাকে সেভ করবেন এ বিশ্বাস তাঁর নেই। কাদের ভয়ে তিনি ভীত একথাও অনেকের অজ্ঞাত। তাঁর ভয় হিন্দুস্থানের হিন্দুকে নয়, প্রোটেস্ট্যান্ট খৃষ্টানকে। তারা সুযোগ পেলেই মারবে। এখানে সরকারী খরচে তিনি দিল্লী, কলকাতা, শিলং, কোহিমা দাপিয়ে বেড়িয়ে গেলেন, কিন্তু নিজের খরচেও তাঁর সাহস নেই লণ্ডনে যাবার। যে কোন সময় আক্রান্ত হতে পারেন, প্রাণান্ত হতে পারে। বিচিত্র ছাগলের দেশ এই ভারতবর্ষ। বিহারী মুসলমান যারা বাংলাদেশে ছিল, তাদের পাকিস্থান ফেরৎ নিল না। বাংলাদেশ রাখতে চাইল না, তারা চলে এল ভারতে। পোপকে কোন খৃষ্টান রাষ্ট্র আমন্ত্রণ জানায় না। গেলে সংবাদপত্রে সংবাদ হয় না। এখানে এগারো কোটি টাকা ব্যয়ে রাজকীয় অভ্যর্থনা। অনেকের ধারণা এটাই ঔদার্য্য। এটা যে আত্মহত্যার রাস্তা, এতে যে অন্যান্য আগ্রাসী শক্তিরা উৎসাহ নিয়ে ভারত ধ্বংসে এগিয়ে আসবে এটা তারা বুঝতে পারে না। বুঝতে পারে না আরও অনেক কিছু। যেমন ভারতবর্ষে একটা ধারণার সৃষ্টি করা হয়েছে যেন হিন্দুসমাজের মত বিভেদ অস্পৃশ্যতা অন্য কোন সমাজে নেই। হিন্দুসমাজে এগুলো ছিল আছে এবং এর বিরুদ্ধ ধারাটিও চিরকাল সক্রিয়। ছুঁৎমার্গ অস্পৃশ্যতাকে ঘৃণা করেন প্রতিটি যুক্তিবাদী হিন্দু। এ নিয়ে বহু পরিবারে পিতাপুত্রে বিরোধ দৃষ্ট হয়। অবশ্য প্রাণঘাতী হয় না কখনো। অন্য সমাজে বিভেদ হয় প্রাণঘাতী, জাতিগত সংঘর্ষ চলে বছ বছর ধরে। খৃষ্টান সমাজে এটা ঐতিহ্য। ক্যাথলিক-প্রোটেস্ট্যান্টরা বিভিন্ন দেশে চিরকাল পরস্পরে লড়ে যাচ্ছে। উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডে এরা রোজ দাঙ্গা করে। ক্যাথলিকরা

সেখানে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। তারা বেশিরভাগ বেকার। যেখানে যাদের শক্তি বেশী সেখানেই তারা অন্যদের অত্যাচার করে। বৃটেনে যোগ্যতা যতই থাক একজন ক্যাথলিক কখনও প্রধানমন্ত্রী হতে পারে না। এরা ছাড়াও অনেক সম্প্রদায় আছে খৃষ্টানদের। যেমন প্রেসবিটারিয়ান 'কানাডিয়ান মিশন', সেভেন ডে এ্যাডভেন্টিষ্ট, বিহোবা উইটনেস, পেন্টাকষ্ট্ এরা কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে না। এরা কিন্তু সবাই খ্রীষ্টান। সবার মুখে শান্তি প্রেমের সুললিত বাণী, পবিত্র ক্রুশ এবং জোব্বার আড়ালে শানিত খড়্গ। যা সম্মিলিত ভাবে ব্যবহৃত হবে অন্যদের প্রতি এবং নিজেদের মধ্যেও। ভারতে খ্রীষ্টান সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য তারা সবাই হাত ধরাধরি করে এগিয়ে চলেছে। ১৯৫০ সালে রাষ্ট্রসংঘের ভারতীয় সদস্য ফাদার জে. ডিসুজা বলেছিলেন, খৃষ্টান মিশনারীদের এখন ভারতে বিশাল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। যা বৃটিশ আমলে হয়নি, ধর্মনিরপেক্ষ শাসন ব্যবস্থায় তা সম্ভব হবে। ওয়ার্ল্ড চার্চেস কাউন্সিল এবং তাদের বেনামী শাখাগুলো ১৯৬৯ সালে এশিয়ায় দাঙ্গা, বিদ্রোহ এবং বিপ্লবের ডাক দেয়। ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলে তারা একটি পুস্তিকা বিলি করে। তাতে পরিষ্কার আহ্বান জানানো হয়েছে অনুন্নত এবং জনজাতিদের ধর্মান্তরিত সংগঠিত করো। দাঙ্গা, বিপ্লব এবং বিদ্রোহের ডাক দাও। 'দি গ্রোথ অফ ব্যাপটিস্ট চার্চেস ইন নাগাল্যাণ্ড' পুস্তিকায় খৃষ্টানেরা বলেছে ঃ আমরা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হতে চাই। যতক্ষণ পূর্ণ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এখানকার মানুষ সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন সার্বভৌমত্বের জন্য লড়াই চালিয়ে যাবে। ১৯৮০ সালের ১লা জানুয়ারী খৃষ্টান ষ্টুডেন্ট লাইব্রেরী থেকে প্রচারিত একটি বুকলেটে লেখা হয়েছে ঃ নববর্ষের এই প্রথম দিনটিতে কোহিমা আর আইজল, ইম্ফল আর গৌহাটি, শিলং আর ইটানগরের চার্চগুলির ঘন্টাধ্বনির আওয়াজে আওয়াজ মিলিয়ে আজকে সগর্বে ঘোষিত হোক আমরা ভারতবাসী নই। এর পরেও খুঁজতে হবে উত্তর পূর্বাঞ্চলে বিচ্ছিন্নতাবাদী কারা? এর চেয়েও সাংঘাতিক খবর আছে। খ্রীষ্টানেরা বাংলাদেশে মুসলমানদের হাতে অত্যাচারিত হয়ে হিন্দুর সঙ্গে গড়েছে 'হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদ'। আর ভারতে ১৯৭৯ সালের মার্চ মাসে 'ক্যাথলিক বিশপ কনফারেন্স অফ ইন্ডিয়া' দেশের গুরুত্বপূর্ণ সাম্প্রদায়িক মুসলমান নেতাদের

সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করে একটি সংস্থা নির্মাণ করেছে, নাম 'এ কমিটি ফর ক্রিশ্চান মুসলীম রিলেশনশিপ ইন ইণ্ডিয়া'। এই সংস্থার লক্ষ্য জাতীয় স্তরে সহযোগিতাপূর্বক ভারত অধিকার। জীবনের সকল ক্ষেত্রে এরা হাত মিলিয়ে কাজ করে চলেছে। খ্রীষ্টানদের সমস্ত কাজকর্মটাই ষড়যন্ত্র, দখলদারী আর ব্যভিচার। যারা অত্যাচারিত হয় তাদের কান্না চাপা পড়ে যায় গীর্জার ঘন্টাধ্বনিতে। প্রতিবাদের আওয়াজ থেমে যায় জেলখানার মত উঁচু পাঁচিলে ধাক্কা খেয়ে। খ্রীষ্টধর্মে সংযমের কথা আছে কিন্তু তারজন্য বিজ্ঞানসম্মত কোন পদ্ধতি নেই। যার ফলে যৌন ব্যভিচার, বিকৃত বাসনা চরিতার্থ এই জীবনের অঙ্গ। চাকরী দেবার নাম করে বহু মেয়েকে ভোগের আহুতিরূপে ব্যবহার করা কিম্বা বিদেশে পাচার করার ঘটনা মাঝে মাঝে সংবাদপত্রে আসে। এ বিষয়ে কেরালা বিখ্যাত, কারণ অঞ্চলটি সমুদ্রের কাছে। নিজেদের দেশ থেকে খ্রীষ্টানেরা শুচিতা, আস্থা, পবিত্রতা, সতীত্ব, বিশ্বাস অনেকদিন আগেই বিসর্জন দিয়েছে। তাই বিশ্বজুড়ে খ্রীষ্টান ধর্মের নামে এই নোংরা চক্রান্ত অব্যাহত। কোন মানুষ নিছক কালো তার কোন রিডিমিং ফিচার নেই এ যেমন হয় না, তেমনি সব খৃষ্টান এই অন্যায় হাসিমুখে মেনে নিচ্ছেন তা কিন্তু সত্য নয়। খৃষ্টানদের পরিচালিত পত্রিকা *AWAKE* অনেকদিন আগে থেকে খৃষ্টানদের উদ্দেশ্যে সাবধান বাণী উচ্চারণ করে যাচ্ছে। হতে পারে পৃথিবী জুড়ে যে হিন্দুত্বের ক্রমবর্ধমান প্রভাব তারজন্যই তাদের সত্য কথনে উৎসাহ। তবু সত্য যেখান থেকেই উচ্চারিত হোক তা প্রশংসা ও অনুসরণযোগ্য। *AWAKE* লিখেছে খৃষ্টান জগতে সর্বত্র পারিবারিক জীবনে ভাঙ্গন ধরেছে। বিবাহ বিচ্ছেদ, ধর্মে অবিশ্বাস, যৌন ব্যভিচার বাড়ছে। কোন পরিবারকে আর ঐক্যের বন্ধনে ধরে রাখা যাচ্ছে না। মানসিক ব্যাধি, অপরাধ প্রবণতা বাড়ছে হুহু করে। অবাধ দৈহিক সংসর্গ খৃষ্টান দেশে এখন আর কোন ব্যাপারই নয়। অবৈধ সন্তানে ছেয়ে যাচ্ছে সারা খ্রীষ্টান দুনিয়া। প্রতি পাঁচজন আমেরিকানদের তিনজন বলে থাকেন বিবাহ। আমার বাবা করেনি, ঠাকুর্দা করেনি, আমিও না। হত্যা প্রবণতা কিরকম বাড়ছে তার সম্পর্কে ১৯৭৩ সালে আনন্দবাজার লিখেছে ঃ বিংশ শতকে যুদ্ধে জড়িয়ে মোট মৃত্যুবরণ করে ৫ লক্ষ ৩০ হাজার মার্কিনী। কিন্তু দেশের মধ্যে পরস্পরে মারামারি করে

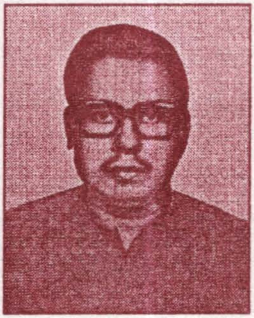
মরে ৭ লক্ষ ৫০ হাজার আমেরিকান। *AWAKE* পত্রিকা খ্রীষ্টানদের। শেষ পর্য্যন্ত তারাও আশঙ্কা করে লিখেছে, শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলিই হয়তো এগিয়ে আসছে। যেটা বলে গেছেন ক্যাথলিক জগতের অশেষ শ্রদ্ধেয় সাধু ম্যালাচি। তিনি বলেছেন ১৯৯৯ সালটাই হবে খ্রীষ্টধর্মের ডুমস ডে অর্থাৎ প্রলয় দিন। এতে কিন্তু আনন্দের কিছু নেই। যে কোন অশুভ দর্শন নিজে নিজেই একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে একথা সত্য কিন্তু যে যতটা পারবে পৃথিবীকে ক্ষতিগ্রস্ত করে দিয়ে যাবে। বিশেষ করে সেই দেশে যেখানে সত্য-মিথ্যা, শুভ-অশুভ একাকার হয়ে আছে ভাবজগতে। ভারতে কিভাবে ধর্মান্তরকরণ চলেছে এখানকার মানুষ তা যেন জেনেও জানতে চান না। মধ্যপ্রদেশ ও বিহারের বনবাসী অধ্যুষিত এলাকায় খ্রীষ্টান কার্য্যকলাপ বৃটিশ আমল থেকে সক্রিয়। এইসব অঞ্চলে এদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ক্রমাগত সরকারকে চাপ দিতে থাকে প্রকৃত অবস্থার তদন্তের জন্য। খ্রীষ্টানদের ভারত বিরোধী হিন্দু বিরোধী ষড়যন্ত্রের তথ্যানুসন্ধানের জন্য ১৯৫৪ সালে বিচারপতি ভবানীশঙ্কর নিয়োগীর নেতৃত্বে সরকার একটি তদন্ত কমিশন গঠিত করেন। তদন্তে দেখা গেল পাদ্রীরা ধর্মান্তরিত করার জন্য ভয় দেখানো, মারপিট, খুনজখম করতেও কসুর করেনি। রাষ্ট্রদ্রোহীতাপূর্ণ ভাষণ দিয়েছে যততত্র। রেভারেণ্ড কেরকাট্টা নামে একজন পাদ্রী ছোটনাগপুরের ধাজি এবং সুখারা গ্রামে বলেছে—কংগ্রেস রাজত্ব অত্যন্ত খারাপ। খৃষ্টান রাজত্ব হলে তোমরা সবরকম সুযোগ সুবিধা পাবে। তোমাদের কাছে সরকারের যে রাজস্ব পাওনা আছে তা দেবে না। সরকারের সংরক্ষিত জঙ্গলের সব গাছ কেটে ফেল। সরকারি অফিসার এবং গ্রামবাসীদের কেউ আপত্তি জানালে তাদের প্রহার করো। বৈকুণ্ঠপুর এলাকায় ষোলজন পাদ্রী চরণ ওঁরাও এর বাড়ী চড়াও হয়। সব জিনিষপত্র ভেঙেচুরে ফেলে দেয়। যাবার সময় চরণকে বলে যায় ধর্ম পরিবর্তনে বাধা দিলে তোমাদের শেষ করে দেওয়া হবে। ক্রিস্টি নামে একজন পালামৌ মিশনের প্রধান ধর্মান্তরিত খৃষ্টানদের চালের চোরাকারবারীতে পরিণত করলেন। নিয়োগী কমিশনের রিপোর্টে এরকম সহস্র ঘটনা আছে। সরকার এদের বিচার করে সাজা দিয়েছিল। জেল থেকে বেরিয়ে আবার পূর্ণোদ্যমে একই কাজ করে যাচ্ছে। কারণ এখন মুরুব্বিদের জোর বেড়েছে।

মাঝে মাঝেই রাষ্ট্রদ্রোহীতাপূর্ণ কাজের অপরাধে বহু পাদ্রীকে ভারত থেকে চলে যাবার আদেশ দিয়েছে সরকার। কিন্তু কেউ যায়নি। খৃষ্টানরা এদেশের সরকার ও আইনকে পাত্তা দেয় না। তাতে সরকার ও আদালত অপমানিত বোধ করে না। কয়েকটি রাজ্যে ধর্মান্তর বিরোধী আইন আছে ১৯৭৭ সালে সুপ্রীম কোর্ট রায় দিয়েছে ঃ অপর কাউকে নিজের ধর্মে ধর্মান্তরিত করার মত কোন মৌলিক অধিকার সংবিধানে নেই। সংবিধানকেও তারা বিন্দুমাত্র পরোয়া করে না। সবচেয়ে আতঙ্কের কথা এটাই যে এদেশের মানুষ অন্যান্য শত্রুদের সম্পর্কে সচেতন থাকলেও এদের সম্পর্কে একেবারেই অচেতন। অনেক হিন্দুত্ববাদী মানুষকেও বলতে শোনা যায় খৃষ্টানেরা মুসলমানদের মত বিপজ্জনক নয়। একথা সত্য ইউরোপ আমেরিকার ক্ষেত্রে ভারতের ক্ষেত্রে নয়। ভারতে মার্ক্সবাদ মৃত্যুপূর্ব শ্বাস টানছে। ইসলাম সম্পর্কে হিন্দুরা এখন অনেকটা সচেতন। হিন্দুর বহু বাড়ীতে এখন কোরাণ হাদিশের চর্চা হয় নিয়মিত। ভয়ে এবং স্বার্থে মুখে যে যাই বলুক ইসলাম কি জিনিষ হিন্দুরা মর্মে মর্মে বোঝে। খৃষ্টানদের ফাদার মাদার সিস্টার বলে তারা আনন্দে গদগদ হয়ে যায়। এটাই বিপদের কথা। সেবা এবং স্বর্গীয় ভাব দেখেই তারা সব ভুলে যায়। পাশ্চাত্যের মানুষ বিজ্ঞানমনস্ক হয়ে ওঠায় তারা সত্যসন্ধানী হয়ে উঠছে। সামাজিক এবং আর্থিক স্বাধীনতা থাকায় সাহসের সঙ্গে সত্য কথা বলতে পারছে। খৃষ্টানদের সংগঠন স্যালভেশন আর্মির জেনারেল বুথ বলেছেন আমাদের ত্রাণ এবং সেবা হচ্ছে বঁড়শী এবং টোপ। যা দিয়ে মাছকে ডাঙায় তোলা হয়। একজন খৃষ্টান মহিলা বলেছেন, ভারতের খ্রীষ্টানদের মধ্যে কি ভয়ংকর জাতিভেদ অস্পৃশ্যতা আছে এদের সঙ্গে না মিশলে বোঝা যাবে না। আর একজন মিশনারী বলেছেন, ক্যাথলিক চার্চ হচ্ছে একটি টাইম বোমা যা একদিন হিন্দুধর্মকে উড়িয়ে দেবে। এটা কিন্তু আর সম্ভব নয়। কারণ খ্রীষ্টান মতবাদ যা অভ্যস্ত বুদ্ধিতে সহজে বোঝার জন্য বহুস্থানে ধর্ম বলা হলো তা ভেতর থেকেই ধ্বসে যাচ্ছে। সারা পৃথিবী জুড়ে সনাতন বৈদিক ধর্মের বিজয়ডঙ্কা বেড়ে চলেছে। টেরেসা চিন্তিত হয়ে ছুটে যাচ্ছে লণ্ডনে, নিউইয়র্কে তরুণ বিজ্ঞানীদের হতাশার সঙ্গে বলছেন, তোমরা যীশুকে চিরকালের জন্য ত্যাগ করলে! ভারতে খৃষ্টানদের চক্রান্ত প্রতিরোধ করার জন্য

বিভিন্ন সংগঠন পাহাড়ে, জঙ্গলে কাজ করে যাচ্ছে। পাহাড় এবং বনজঙ্গলে এরা রীতিমত সক্রিয়। সেবা, শিক্ষার ব্যাপারে 'বনবাসী কল্যাণ আশ্রম' ও 'বিবেকানন্দ কেন্দ্র' কাজ করে যাচ্ছে। সেবা, শিক্ষার সঙ্গে শুদ্ধি করে খৃষ্টানদের হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে আনার কাজ ব্যাপক ভাবে করে যাচ্ছে 'আর্য্য সমাজ' 'বিশ্ব হিন্দু পরিষদ' 'ভারত সেবাশ্রম সংঘ'। নিমকের দাম দিতে হয় বলে এসব সংবাদ সংবাদপত্রের পাতায় আসেনা। মেঘালয়ের একাধিক সম্মানিত খৃষ্টানপাদ্রী ফিরে এসেছেন হিন্দু সমাজে। এদের অনেক ভাষণ হয়েছে কলকাতায়। সাংবাদিকেরা লিখে নিয়ে গেছেন, ছাপতে পারেননি। ফাদাররা যদি ধমক দেয়। এতে অবশ্য সত্য চাপা পড়ে না। ধীরে ধীরে মানুষের জ্ঞানচক্ষু খুলছে। তুরীয় আনন্দে যারা যীশুর মহিমা কীর্তন করতেন সেই নির্বোধ পাগল এবং ব্রহ্মজ্ঞানীদের ঘোর কাটছে। ক্রুশ বাইবেলের অন্তরালে রাষ্ট্রবিরোধী মানবতা বিধ্বংসী সর্বনাশা কাজকর্ম লোকের চোখে পড়ছে এবং বুঝতে পারছে।

টেলপীস

লণ্ডনে প্রচলিত গল্প। দুই বন্ধু পথে একটি মানিব্যাগ কুড়িয়ে পেল। তাতে পাউণ্ড ভর্তি। একজন দেখেছিল, অন্যজন তুলেছিল। টাকাটা কে নেবে? রাস্তার ধারে একটি বিরাট ক্রুশের তলায় বসে দুই বন্ধু ঠিক করল যে সেরা মিথ্যে কথা বলতে পারবে মানিব্যাগ তার। মিথ্যের প্রতিযোগিতা সুরু হলো। কেউ হারে না। একজন ফাদার যাচ্ছিল রাস্তা দিয়ে। এরা ডেকে বলল ফাদার আমরা মিথ্যে কথার কম্পিটিশন করছি। আপনি কে শ্রেষ্ঠ বিচার করে দিন। ফাদার জিভ্ কেটে বুকে ক্রুশ এঁকে বলল ঃ ছি ছি আমি খ্রিস্টান ফাদার। সারা জীবনে একটা মিথ্যে কথা বলিনি। আমাকে বলছো মিথ্যে কথার বিচার করতে। দুজন বন্ধু দুজনের দিকে তাকাল, তারপর বলল ফাদার আমরা দুজনেই হেরে গেছি। আপনি জিতেছেন। এই নিন ব্যাগ। জীবনে একটাও মিথ্যে কথা বলেননি, এটাই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মিথ্যে কথা।



শিবপ্রসাদ রায় (১৯৩৭-১৯৯৯)

লেখক পরিচিতি

শিবপ্রসাদ রায়-এর জন্ম ১৯৩৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার ছোট্ট শহর কালনায়। শৈশবেই তিনি পিতৃহারা হন। বাল্যকাল কেটেছে অত্যন্ত দারিদ্রের মধ্যে। স্কুল কলেজের প্রথাগত শিক্ষা যা বাঙালি মধ্যবিত্ত ঘরের ছাত্রছাত্রীরা সাধারণতঃ পেয়ে থাকে দারিদ্রের কারণে সেটা থেকেও তিনি বঞ্চিত হন। তাঁর শিক্ষাদীক্ষা একরকম স্বোপার্জিত বলা চলে। শিক্ষার প্রতি তাঁর অদম্য আগ্রহ তাঁকে নিরুৎসাহিত করতে পারেনি। ম্যাক্সিম গোর্কির মতই শিবপ্রসাদ রায় কঠিন, নির্দয়, বাস্তবজীবন থেকেই তাঁর শিক্ষার রসদ সংগ্রহ করেছেন।

হিন্দু সমাজের বর্তমান দুর্ভাগ্যজনক অবস্থায় তিনি ব্যথিত, বিষাদ ক্লিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। বয়ঃসন্ধিকাল থেকেই তিনি হিন্দু জাগরণের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তিনি অকৃতদার ছিলেন। প্রবন্ধ রচনা, পুস্তক, পুস্তিকা প্রকাশনা, জনসভায় বক্তব্য রাখা ছাড়াও হিন্দু সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য তিনি বিশ্বহিন্দু পরিষদ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ প্রভৃতি হিন্দু সংগঠনগুলির সঙ্গে আজীবন যুক্ত ছিলেন। তাঁর পুস্তক-পুস্তিকাগুলি ইংরেজি, হিন্দি, তামিল, মারাঠি, গুজরাটি প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদিত হয়ে যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছে। তাঁর রচনাগুলি ছিল অত্যন্ত সবল, সহজবোধ্য এবং মর্মস্পর্শী ও অত্যন্ত যুক্তিনিষ্ঠ।

হিন্দু সমাজের সচেতনতা বৃদ্ধিতে তাঁর অবদান অনবদ্য। তাঁর আদর্শবাদ, সমকালীন ঘটনাবলী সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ জ্ঞান, তাঁর নিবন্ধ এবং বক্তব্য ভারতের হিন্দুদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর শাসনকালে 'আপৎকালীন' সময়ে তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল। ফলে তিনি জনগণের আরও প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। ১৯৯৯ সালে মাত্র ৬২ বছর বয়সে 'সেরিব্রাল এ্যাটাকে' তিনি আক্রান্ত হন এবং তাঁর জীবনাবসান হয়।

মূল্য ঃ ৬.০০ টাকা।